কোয়ান্টাম মেথড-৯

বৌদ্ধ প্রীতির নমুনা

মুফতী শরীফুল আ'জম

যদিও কোয়ান্টাম সকল ধর্মের লোকদের আকৃষ্ট করতে প্রত্যেক ধর্মের কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে ধর্মের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব কোয়ান্টামে প্রস্ফুটিত হয় তা হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম। আবির্ভাব, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও ধ্যান ধারণার ব্যাপক মিল লক্ষ্য করা যায় এতদুভয়ের মাঝে।

প্রবর্তন:

বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর প্রবর্তক হলেন গৌতমবুদ্ধ। পিতা শুদ্ধোদন শ্যাক্যবংশের প্রধান বা রাজা ছিলেন। গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দের এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তীথির গভীর রাতে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৌতম চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হন। প্রথমে তিনি তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আলারা ও পরবর্তিতে উদ্দকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্তির পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে দুঃখের রহস্য উদঘাটন তথা মুক্তির সন্ধান না পেয়ে পাঁচজন সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে নির্জন জঙ্গলে কঠোর কৃচ্ছ সাধনে ছয় বৎসর তপস্যা চালান। কিন্তু তাতে নিষ্ফল হন। তখন গৌতম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মধ্যম পন্থায় সাধনার উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্তী উরবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। সেখানে নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষ তলে দুঃখের রহস্য সন্ধানে পূণরায় ধ্যানমগ্ন হন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ দিন পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ মানব জীবন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগত 'সব্বং দুঃখময়' অর্থাৎ জগত দুঃখময়। এই দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুঃখের কার্যকারণ ও প্রতিকারের সন্ধান পেয়েছিলেন।(ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১-৬৮৩)

এই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের ইতিহাস। কোয়ান্টাম মেথড প্রবর্তনের ইতিহাসও ঠিক একই ভাবে সাজানো হয়েছে। দুঃখের প্রতিকার করতেই কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম শেষে সন্ধান পাওয়া গেছে এই কোয়ান্টাম মেথডের। কোয়ান্টামের গুরুর কাছে করা এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমরা জানি আপনি এক সময় সাংবাদিকতা করতেন। তারপর এস্ট্রলজি (রাশি চর্চা) করেছেন। সেসব ছেড়ে আপনি কেন কোয়ান্টামে এলেন?

উত্তর: আমি কেন কোয়ান্টামে? হ্যাঁ। এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এবং এর উত্তর ও আমার কাছে সুস্পষ্ট। তবে উত্তর দেয়ার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলা দরকার। প্রথমে বলি সাংবাদিকতায় কিভাবে এলাম? তারুণ্যে যখন মানুষের দুঃখ কষ্ট অভাব বঞ্চনা দেখেছি, মনে হয়েছিল এ দুঃখের কথা, কষ্টের কথা যদি লেখা যায় তাহলে কিছু একটা হবে। শুরু করলাম রিপোর্টারের কাজ।... কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বুঝলাম বাইরে থেকে যাই মনে হোক, একজন সাংবাদিকের স্বাধীনতা আসলে খুব সীমিত। তাকে লিখতে হয় পত্রিকার মালিকের ইচ্ছানুসারে, সত্য জানাতে চাইলেও জানানো যায় না। সিদ্ধান্ত নিলাম সাংবাদিকতা ছেড়ে দেবো। ...এস্ট্রলজির প্রতি আগ্রহ ছিলো। এই শখকেই পেশা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।কারণ মনে হলো, একজন মানুষকে যদি ভালো পরামর্শ দেয়া যায়। একটা গাইডলাইন দেয়া যায় তাহলে তার দুঃখটাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন বা তাকে যদি সতর্ক করে দেয়া যায়, তাহলে দুঃখ থেকে তিনি হয়তো দূরে থাকতে পারবেন।... তবে একজন এস্ট্রলজার হিসেবে আমার সীমাবদ্ধতা ছিলো।...দুঃখ বলতে পারছি, কিন্তু দুঃখের কোন সমাধান দিতে পারছিনা। প্রতিকার করতে পারছিনা। এই অতৃপ্তি ছিলো, দুঃখবোধ ছিলো। আর যেহেতু ধ্যান মেডিটেশনের সাথে তারুন্যেই পরিচয় ছিলো, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ...মেডিটেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে বিপন্ন অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করা সম্ভব। বুঝলাম তার ভেতরের শক্তির জাগরণ ঘটিয়েই তার দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যার্থতাকে সাফল্যে, আর অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করা যাবে। যখন বুঝলাম তখন আর সময় নেইনি। যেভাবে সাংবাদিকতা ছেড়ে ছিলাম, তেমনি এস্ট্রলজি ছেড়ে কোয়ান্টামে নিজেকে সঁপে দিলাম। ...আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছি এখন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/৪২৯-৩১)

বোঝাগেলো মানুষকে দুঃখ মুক্ত করতে প্রথমে সাংবাদিকতা তার পর জ্যোতিষী অবশেষে মেডিটেশনের পথ অবলম্বন করে কোয়ান্টাম মেথড উদ্ভাবন করা হয়। এই একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের

জন্য গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।অথচ মানব মুক্তির পথ মানব বুদ্ধি বলে উদ্ভাবন সম্ভব নয়। মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে এত্তেবায়ে সুন্নাত তথা মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের অনুসরণ। মনে প্রাণে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হলে মুক্তির জন্যে অন্য কোন মেথড বা জীবনদৃষ্টি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"(সুরা আল-আহযাব-২১)

বৌদ্ধ ধর্মে আল্লাহ তা'আলা বা শেষ দিবসের কোনো ধারণা নেই। তারা নাস্তিক এবং পরকালে অবিশ্বাসী। তাই তারা মুক্তি পেতে নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ ভিন্ন বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে। কিন্তু যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা সফলতা ও মুক্তির পথ হিসেবে নবীজীর আদর্শ অনুসরণ করবে না কি কোয়ান্টামের? চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে– "মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।" (সূরা আন্নুর-৫১) আলোচ্য আয়াতটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল, চল তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মিমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এজলাসে মুকাদ্দামা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবর্তে কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মুকাদ্দামা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

অতএব, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ বাদে অন্য কোনো মেথড বা জীবন দৃষ্টির মাঝে সফলতা ও মুক্তির পথ খোঁজা মুমিনের কাজ হতে পারে না। মুমিন তো সর্বাবস্থায় তার সকল সমস্যার সমাধান নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত দ্বীনে ইসলামের মাঝে সন্ধান করবে।

মূল উৎস:

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে নীতি, বিধানও মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই 'বৌদ্ধদর্শন' বা 'বৌদ্ধধর্ম'। বুদ্ধের উপদেশবাণী ও চিন্তাধারাই বৌদ্ধ দর্শনের উৎস ও ভিত্তি। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৮১)

ওহী বা ঐশী বাণীর সাথে এধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। একজন মানবের বিবেক প্রসূত সফলতার সূত্রসমূহ এখানে মেনে চলা হয়।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। মহাজাতক কর্তৃক উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টি, চিন্তা-ধারা, উপদেশ ও বাণীসমূহই এই মেথডের উৎস ও ভিত্তি। নির্দিষ্ট কোনো ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ কোয়ান্টামে করা হয় না। বরং সকল ধর্মের নির্যাস নিজের বুদ্ধিতে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের লেভেল লাগিয়ে চালানোর পন্থা গ্রহণ করা হয়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস- ১৪৩)

পরকাল:

বুদ্ধের বাণী ও দর্শনসমূহ জগত ও জীবন কেন্দ্রিক ছিল, যেখানে জগতের দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আখেরাত বা পরকালের কোন আলোচনা সেখানে নেই। পরকালের মুক্তি বা দুঃখ লাঘব কি করে হবে? তা ওই দর্শনে স্থান পায়নি।

কোয়ান্টাম মেথডের অবস্থাও তাই। "সাফল্যের চাবিকাঠী কোয়ান্টাম মেথড"বই এর কভারের শেষ পৃষ্ঠায় মহাজাতকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে;" জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক" ।অর্থাৎ এখানে শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের টেকনিক নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে আখেরাতের ধ্যান-ধারণা বা সমস্যা সমাধানের কোন আলোচনা নেই। এক প্রবন্ধে মহাজাতক লিখেন "একটাই তো জীবন। সুখ সাফল্য আনন্দ খ্যাতি পার্থিব বা আত্মিক যা কিছু অর্জন তা তো এই এক জীবনেরই ফসল।" (কো.উ.-৬) আখেরাতের বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে একটাই তো জীবন এমন বক্তব্য দেয়ার কোন অবকাশ কি আছে? বরং পার্থিব এ জীবনের পর আখেরাতের আরেক জীবন সামনে রয়েছে আর সেটাই চিরস্থায়ী ও আসল জীবন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত"।(সুরা আল- আনকাবুত–৬৪)

হ্যাঁ, অবিশ্বাসী তথা কাফেররা পরকাল বিশ্বাস করে না। তারা বলে, "আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা

পূনরুত্থিত হবো না।" (সূরা আল-মুমিনুন-৩৭) অর্থাৎ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই অংশ এবং পরকালের জীবন বলতে কোনো কথা নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বিশ্বাসও তাই।

কোয়ান্টাম মেথডও মুক্ত বিশ্বাসের নামে বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে এই কুফরী বিশ্বাসই মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টামের মতে পার্থিব বা আত্মিক অর্জনের জন্যই এ জীবন, আখেরাতের জন্য নয়। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সূরা আল-মুলক-০২) হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ احسن عملا পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী যে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বিষয়াদী থেকে সর্বাধিক বেচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উম্মুখ হয়ে থাকে। (কুরতুবী)

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্ম যেমন শুধু জগত ও জীবনের সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ। অনুরূপ কোয়ান্টামও শুধু জাগতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান দেয়, আখেরাত বাদ।

দুঃখের কারণঃ

বুদ্ধের দর্শন মতে জগতে দুঃখের কারণ মোট ১২ টি। তন্মধ্যে অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা বা আসক্তি উল্লেখযোগ্য। এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে লোভ, দ্বেষ ও মোহ রূপেও চিহ্নিত করা হয়। (ইস.আ.ভ্রা.-৬৮৪) কোয়ান্টামও এ ব্যাপারে একমত এবং ওই সকল পরিভাষাই হুবহু কোয়ান্টামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অবিদ্যাঃ

যেমন অবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে; "সকল ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য, ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাসের নামই অবিদ্যা। আর এ অবিদ্যাই মানবজীবনের অশান্তির মূল কারণ।" (কো. কণিকা-১৬)

"লালসা কামনা বাসনা আসক্তি লোভ দ্বেষ মোহের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।... সকল অশান্তির মূল যেমন অবিদ্যা, সকল অকল্যাণের মূলও অবিদ্যা।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/২৮৪)

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তথ্য বা ধারণার সংজ্ঞা ঠিক করার মাপকাঠি কি হবে? বুদ্ধের দর্শন, কোয়ান্টাম মেথড নাকি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ? যেমন ধরুন; ইসলাম গান-বাদ্য ও পর্দাহীনতাকে হারাম বলে। আর কোয়ান্টাম তাদের মিউজিক ও বেপর্দা নারী-পুরুষের মেলাকে হালাল বলে। এগুলো তাদের মতে অবিদ্যা নয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব-১/৫১,১/২৯০) এখন কার কথা সঠিক? কোয়ান্টিয়ার ভায়েরা উত্তর দিন।

সংস্কারঃ

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'সংস্কার' প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম বলে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্তির পথ মেডিটেশন"। এবং "ভ্রান্ত ধারনা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াটাই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কণিকা-১৫-১৬)

আসক্তিঃ

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে নির্ধারিত দুঃখের অন্যতম কার্যকারণ 'তৃষ্ণা' বা 'আসক্তি' প্রসঙ্গে কোয়ান্টামের অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে- "চাওয়া যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সেটা আসক্তি। দুঃখের প্রধান কারণ এই আসক্তি।" (কোয়ান্টাম কণিকা ১৮, হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৩০৯)

উত্তরণের পথঃ

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুঃখের যে ১২ টি কারণ রয়েছে এগুলো হচ্ছে দুঃখের একেকটি শৃঙ্খল। এসকল শৃঙ্খল গুলো ছিন্ন করতে পারলেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আর ছিন্ন করার পদ্ধতিই হলো বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম দর্শনের মূল শিক্ষা। যার সারকথা হলো শৃঙ্খলা। অর্থাৎ দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শৃঙ্খলা। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ.-৬৮৩-৬৮৪)

কোয়ান্টামের বিভিন্ন বই পুস্তকেও একথা বারবার আলোচিত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল মুক্তির নানান কৌশল নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কোয়ান্টামের কয়েকটি সূত্র এখানে তুলে ধরা হলো। "শৃঙ্খলাই শৃঙ্খল মুক্তির পথ"।"বিশ্বাস শৃঙ্খল মুক্ত করে আর গোঁড়ামী শৃঙ্খলিত করে"।"কাম শৃঙ্খলিত করে আর প্রেম জীবনকে শৃঙ্খল মুক্ত করে"। "মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ তার শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে"। "ভ্রান্তধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল মুক্তির পথ মেডিটেশন।" (কোয়ান্টাম কনিকা-১৬)

বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনার মাধ্যমে এই শৃঙ্খলা আয়ত্ব করতে পারলেই শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করা যাবে। অনুরূপ কোয়ান্টাম ও মেডিটেশনকে শৃঙ্খল মুক্তির সাধনা নির্বাচন করেছে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই দুঃখ জয় ও সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

নির্বাণ লাভ :

বুদ্ধের উদ্ভাবিত ধর্ম দর্শনে নির্বাণ তথা অস্তিত্ব হতে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে একজন ধার্মিক মানুষের মূল চাওয়া-পাওয়া। তাদের সকল সাধনা আরাধনা মূলত এই নির্বাণের উদ্দেশ্যে

হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কোন কথা নেই। আছে নির্বাণ লাভ অথবা পূণরপূণর জন্মলাভ করে জগতের দুঃখে নিপতিত হওয়া। তাই যে ভালো কাজ করবে সে দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং নির্বাণ লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে এ দুনিয়ায় পূণর্জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে জগতের দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হবে। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা মূলত পূণর্জন্মের নিরোধ হওয়া, তৃষ্ণা,ক্ষয়, রাগ,দ্বেষ ও মোহ এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করাকে বোঝায়। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা, যা সব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার মুক্ত। (ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ-৬৫৮)

কোয়ান্টামও এই একই দর্শনের প্রচারণা চালাচ্ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাষাটা কিছু কিছু পরিবর্তন করে নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়া রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। জান্নাত লাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে এখানে কোন আলোচনা নেই। নির্বাণ বলতে বৌদ্ধরা যা বোঝায় কোয়ান্টামের ব্যাখ্যাও তাই, শুধু ভাষাটা আলাদা। নির্বাণ শব্দের স্থলে তারা 'স্বাধীনতা', 'প্রকৃতির সাথে একাত্মতা', 'নিজেকে লীন করা' কিংবা 'মহাচেতনায় মিশে যাওয়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন বলা হয়েছে– "ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত বিশ্বাসে উপণীত হওয়াটাই হচেছ মানুষের আসল স্বাধীনতা।"(কোয়ান্টাম কনিকা-১৬) আসল স্বাধীনতা তথা নির্বান লাভ, যা ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের মত দুঃখের শৃঙ্খল হতে মুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। কোয়ান্টামের সাধনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচেছ এই স্বাধীনতা, মহাচেতনায় মিশে যাওয়া, প্রকৃতির সাথে এক হয়ে নিজের অস্তিত্বকে লীন করা। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচেছ। শিথিলায়নের (ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি) অনুশীলনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে– "অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই, পরিনত হয়েছে বালু কণায়। অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন বালু কণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙ্গুল, হাত,পা, বুক, পেট, উরু, সব বালুর মত ঝড়ে ঝড়ে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচেছন এক বালুর স্তুপে। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে।বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর ঝড় আপনার শরীরে অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালু কণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণ শিথিল।" (সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড -৫৯)

নির্বাণের এই অনুশীলনের নাম কোয়ান্টাম রেখেছে শিথিলায়ন। নির্বাণ আর শিথিল হওয়াটা যেন একই অনুভুতির নাম। যেখানে দেহের অস্তিত্ব প্রকৃতির সাথে মিশে লিন হয়ে যাবে আর রবে শুধু চেতনাও মন।

এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ধ্যানের প্রাথমিক অনুভুতি, এর চেয়ে আরো গভীর স্তরের ধ্যান হচেছ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন। যেখানে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় নিজের চেতনাকে লীন করে, এ্যলোমিনিয়াম, তামা, পিতল, ইস্পাত, চুম্বক, সীসা, রাবার ইত্যাদি ধাতুর দেয়াল ভেদ করার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন লতা-পাতা, ফল, ফুল, গাছ-পালা, গ্রহ-তারা, সাত সমুদ্র ও প্রকৃতিক দৃশ্যের মাঝে নিজেকে মিটিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার অনুশীলন করানো হয়। অবশেষে একথা কল্পনা করতে বলা হয়। "আপনি এবার পরিপূর্ণভাবে অনুভব করুন, আপনি যত ক্ষুদ্রই হোন, এখন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। আপনি প্রকৃতির শক্তির সাথে একীভূত হয়েছেন। আপনার চেতনা মিশেগেছে মহাচেতনার সাথে। তাই আপনার যে কোনো সমস্যাই থাকনা কেন, তা এখন আর আপনার সমস্যা নয়, পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সমস্যায়।আর তা সমাধানের দায়িত্ব শুধু আপনার চেতনার উপরই বর্তায় না, বর্তায় মহাচেতনার উপর। আপনি মহাচেতনার হাতে ফলাফলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের কাজ করে যান। কাজের ফলাফল ও সাফল্যে আপনি চমৎকৃত হবেন।" (কোয়ামন্টাম মেথড ১৯৭-২০০)

অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মিশে একাত্ম হতে পারলে সব সমস্যার সমাধান প্রকৃতিই করে দিবে। (নাউযুবিল্লাহ) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বান লাভের বাস্তবতাও তাই। নির্বান লাভ করে অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হতে পারলে সকল দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা ফরজ এবাদতের পর নফল এবাদত বন্দেগী করতে করতে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার থাকে না আল্লাহর হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে যায়। তখন তার সকল ইচ্ছা আল্লাহর অধিনে পরিচালিত হতে থাকে। আর তার সকল চাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে পূরণ হতে থাকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫০১)

কোয়ান্টাম হাদীস নির্দেশিত ফানা

ফিল্লাহর পরিবর্তে প্রকৃতির মাঝে ফানা হয়ে যাওয়ার অনুশীলন করাচ্ছে। আর মানুষকে প্রকৃতির অধিনে সঁপে দিচ্ছে। সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পাওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির কাছ থেকে কামনা করছে। এধরণের মেডিটেশনের অনুশীলন শিরক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে কি?

একটি বিভ্রান্তির জবাবঃ

প্রকৃতি পূজার পক্ষে সাফাই গেয়ে কোয়ান্টাম প্রশ্ন-উত্তর আকারে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে।

প্রশ্নঃ প্রকৃতির সাথে একাত্মতা মেডিটেশনে বলা হয় যে, এখন থেকে কোন সমস্যাই আপনার সমস্যা নয়। এখন প্রকৃতিই আপনার সমস্যা সমাধান করবে। কিন্তু সকল সমস্যা সমাধান তো করবেন আল্লাহ। প্রকৃতি কীভাবে আমার সমস্যা সমাধান করবে?

উত্তরঃ এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমরা এখানে যে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দনের কথা বলছি তা একটু বোঝার চেষ্টা করি। আসলে প্রকৃতি কার সৃষ্টি? কে চালান প্রকৃতি? উত্তর হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম, যে নিয়মে প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হয়। (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/২২৩)

কোয়ান্টামের এই উত্তরটা খোঁড়া যুক্তি ও শিরকের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। উত্তরের সার কথা হলো প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক এবং এর মাধ্যমে মানুষের সমস্যা সমাধান করা আল্লাহর নিয়ম। তাই প্রকৃতির কাছে সমস্যার সমাধান কামনা বৈধ। অথচ সাধারণ বিবেকের কথা হলো প্রকৃতি নিজেই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি তাই সকলের স্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে চাইলেই তো হয়, প্রকৃতির কাছে চাওয়ার কি প্রয়োজন? রাজা তার কার্যাদী উজির-নাযিরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন এটাই সাধারণ নিয়ম। তাই বলে কি রাজার পরিবর্তে উজিরের বরাবর দরখাস্ত লিখা, উজিরের কাছে নিজেকে সমর্পন করা বৈধ হবে? এটাকেই বলে শিরক। মুশরিকগণ সকলেই আল্লাহ পাকের উপর ঈমান রাখে তাকে স্রষ্টা মনে করে, কিন্তু তার সাথে অন্যান্যদের শরীক সাব্যস্ত করে তাদের পূজা করে বলে তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়। তদ্রুপ প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ পাক একথা বলে আবার সেই সৃষ্ট বস্তুর কাছে সমস্যা সমাধান কামনা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সমস্যা সমাধান তো করবেন একমাত্র আল্লাহ পাক, চাই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী করুন বা ব্যতিক্রম কোন পন্থায়। তাই সমাধান কামনা করতে হবে একমাত্র তাঁরই কাছে। গাছ-পালা, লতা-পাতা বা কোন ধরণের মাখলুকের কাছে সমাধান কামনা ও তার সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশন নিঃসন্দেহে শিরক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তিনিই সে মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাক্বারা-২৯) অর্থাৎ কুল মাখলুকাত মানুষের সেবক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। আর মানুষদের নিয়োজিত করা হয়েছে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এসকল সেবকের সেবা গ্রহণ করে স্রষ্টার সকল হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে আখেরাতের তৈয়ারী করাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তাঁর সকল বিধি-বিধানের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়াই হচ্ছে মানুষের আসল সফলতা। তাই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে লীন না করে প্রকৃতির স্রষ্টার মাঝে নিজেকে লীন করতে হবে। এর বিপরীত প্রকৃতির সাথে একাত্মের অনুশীলন অপাত্রে কৃতজ্ঞতার সমতুল্য। যেমন, কেউ যদি মানি অর্ডার পেয়ে ডাক পিয়নের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়, তার গুণ কীর্তনে মুখর হয় আর টাকা প্রেরকের কথা ভুলে যায় তবে সে কৃতঘ্ন হিসেবে গণ্য হবে। অনুরুপ প্রকৃতির স্রষ্টার কথা ভুলে গিয়ে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যার সমাধান প্রকৃতির কাছে কামনা করাও আল্লাহর নাফরমানী হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সকল সমস্যা প্রকৃতির মাধ্যমে সমাধান করার অনুশীলন করতে পারে না। বৌদ্ধরা যেহেতু আল্লাহ ও আখেরাতের বিশ্বাসী নয় তাই তারাই প্রকৃতি পূজার এ পদ্ধতী উদ্ভাবন করে ও এর অনুশীলন করে থাকে। মুমিন মুসলমান হতে হলে সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে, কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাস অনুসারে প্রকৃতির কাছ থেকে নয়।

মোট কথা, বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে দুঃখ জয় করা। দুঃখের কারণসমূহের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তাদের ধর্মের সকল সাধনা-আরাধনা প্রবর্তিত হয়েছে ও চর্চিত হয়ে আসছে। কোয়ান্টাম মেথড ও সেই একই পথে হেটে চলছে শুধু ভাষাটা আধুনিক। এবং দুঃখ জয়ের জন্যে শৃঙ্খল ভঙ্গের বিভিন্ন টেকনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। যেহেতু বর্তমান যুগটা বিজ্ঞানের যুগ বলে প্রসিদ্ধ তাই কোয়ান্টাম বৌদ্ধ ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সজ্জিত করে কিছুটা চমক সৃষ্টি করে নিজেকে এর উদ্ভাবক হিসেবে জাহির করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কোয়ান্টামকে বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক মডেল বলে মনে হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। ঈমান বিধ্বংসী এই মেথড থেকে আল্লাহ পাক সকলকে রক্ষা করুন।